জাতিসংঘের স্বরূপ উন্মোচনে
একত্ববাদী উম্মাহর প্রতি নসিহত

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ

AS SAHAB MEDIA

ডিসেম্বর ২০২১/হিজরি ১৪৪৩

জাতিসংঘের স্বরূপ উন্মোচনে একত্ববাদী উম্মাহর প্রতি নসিহত

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা

AN-NASR

-মূল প্রকাশনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য-

মূল নাম:

نصيحة الأمة الموحدة بحقيقة الأمم المتحدة

ভিডিও দৈর্ঘ্য: ৩৮:২৮ মিনিট

প্রকাশের তারিখ: ১৪৪৩ হিজরি, ২০২১ ঈসায়ী

প্রকাশক: আস সাহাব মিডিয়া

সূচিপত্র

ভূমিকা..... ৫

জাতিসংঘের অঙ্গীকার ও সনদপত্র ৬

১৯৪৮ সালে প্রকাশিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন..... ২১

ইউনেস্কোর কার্যক্রম..... ২৭

পরিশিষ্ট ৩০

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য! পরিপূর্ণ রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার পরিজন ও সাথী বর্গের উপর এবং তাঁর ভক্ত অনুরাগী সকলের উপর।

গোটা বিশ্বের মুসলিম ভাইয়েরা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

হামদ ও সালাতের পর...

আজ আমি মুসলিম উম্মাহকে 'জাতিসংঘ' নামক এক ভয়াবহ বিপদের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য কিছু আলোচনা করতে চাচ্ছি। আমি আবার আলোচনাকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করেছি।

- ভূমিকা
- জাতিসংঘ সনদের কিছু পয়েন্ট সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন
- মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন
- ইউনেস্কোর কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু তথ্য
- মুসলমানদের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের শত্রুতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- পরিশিষ্ট

***

ভূমিকা

প্রথমেই বলে রাখা উচিত, জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী পক্ষ। সারাবিশ্বের উপর নিজেদের ইচ্ছাধীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো চাপিয়ে দিতে আর এসবের মাধ্যমে গোটা মানব সভ্যতাকে শাসন করতে তারা এই সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিল। যদিও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হিসেবে প্রতারণামূলক-

ভাবে তারা বক্তব্য দিয়েছিল। তারা বলেছিল, জাতিরাষ্ট্রগুলোর পারস্পারিক সহযোগিতার পথ তৈরি করতেই এই সংঘের প্রতিষ্ঠা।

***

জাতিসংঘের অঙ্গীকার ও সনদপত্র

জাতিসংঘ সনদের প্রতি যদি আমরা দায়সারাভাবেও দৃষ্টিপাত করি, তবুও আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় - সারা বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য, নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত সেকুলার 'দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবধারা' সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেবার জন্যই এই সংঘের প্রতিষ্ঠা। সামনে এই জাতিসংঘের প্রতিটি পদক্ষেপ যে ইসলামী শরীয়তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক সেকথাও আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে ।

জাতিসংঘ সনদের উপর যদি আমরা গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খোলাসা হবে:

১) প্রথমত: শরীয়তবিরোধী সংবিধান দ্বারা আইন রচনা ও বিচার ফায়সালা।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিভিন্ন বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেগুলো হয়ে থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ণীত হয় কোন বিষয়ে প্রাপ্ত ভোটের দুই-তৃতীয়াংশের ভিত্তিতে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। অবশিষ্ট বিষয়াবলীতে কিছুমাত্র সংখ্যাধিক্য হলেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ধারিত হয়।

আর সাধারণ পরিষদের উপর ক্ষমতা হলো নিরাপত্তা পরিষদের। স্থায়ী পাঁচ সদস্যের[১] বোর্ড এই পরিষদ নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমান পৃথিবীতে অপরাধী চক্রের হোতা

---

[১] নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ২ ধরণের।
১. স্থায়ী সদস্য
২. অস্থায়ী সদস্য
১. স্থায়ী সদস্য - ৫টি। এদের ভেটো প্রদানের ক্ষমতা আছে। এরা হল – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও চীন।
২. অস্থায়ী সদস্য – ১০ টি। এরা সাধারণ পরিষদের সদস্য দেশগুলোর ভোটের ভিত্তিতে প্রতি ২ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়।

এই পাঁচ সদস্য। তাই তাদের মতামত ও সম্মতি ছাড়া যেকোনো আইন ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া অসম্ভব।

তো আমরা বলতে চাচ্ছিলাম, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আইন প্রণয়নের একচ্ছত্র অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠের। আর তাদের উপরে রয়েছে নিরাপত্তা পরিষদ। তারও উপরে রয়েছে স্থায়ী পাঁচ সদস্যের বোর্ড। আর এই পাঁচ সদস্যই মূলত জাতিসংঘের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক।

জাতিসংঘকে পোস্টমর্টেম করলে যা বের হয়ে আসে তা হল, এক জাহেলিয়াতের উপর আরেক জাহিলিয়াত, তার উপর আরেক জাহিলিয়াত। কারণ আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা তাঁর কিতাবে কারীমে আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর বিধান ছাড়া অন্য যে কোনো বিধান হলো জাহিলিয়াতের বিধান। আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা ইরশাদ করেন—

أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"অর্থঃ তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে? (সূরা মায়েদা ৫:৫০)

এমনিভাবে জাতিসংঘের সনদের প্রথম অনুচ্ছেদে এসেছে—

"জাতিসংঘের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো: 'আন্তর্জাতিক শান্তি, স্থিতি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা' .... সামনে গিয়ে বলা হচ্ছে....."সহিংস কর্মকাণ্ড সহ আরও যত ব্যাপার রয়েছে যেগুলো শান্তিকে ব্যাহত করে, সেগুলোর বিনাশ সাধন, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সেগুলোর প্রতিকার, ন্যায়নীতি, ইনসাফ ও আন্তর্জাতিক নিয়মের আলোকে সেগুলোর সমাধান এবং এতদনুযায়ী বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকিমূলক আন্তর্জাতিক সবরকম দ্বন্দ্ব সংঘাত ও বিরোধের মীমাংসা নিশ্চিত করা।"

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ হাসান নাফেয়া উপরোক্ত অনুচ্ছেদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেন—"এটা পরোক্ষভাবে এটাই বুঝায় যে, আন্তর্জাতিক সংঘাতগুলোর মীমাংসা ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জাতিসংঘ নিজ থেকে কোন চুক্তি বা সম্মতি অনুমোদন করতে পারে না। বরং সেই চুক্তি যদি

আন্তর্জাতিক আইন বা ন্যায়বিচারের (তাদের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার) সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে সেটাকে পরিবর্তন বা বাতিল করার আদেশ দিতে পারে"
অতএব যে রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করবে, প্রকারান্তরে সে শরীয়ত ভিন্ন অন্য সংবিধান থেকে আইন ও বিচার ফয়সালা গ্রহণ করে নেবে। এমন রাষ্ট্র শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করেছে বলে ধর্তব্য হবে। আর যখনই কোন রাষ্ট্র জাতিসংঘের অঙ্গীকারনামা ও সনদে স্বাক্ষর করবে, তার দ্বারা এটা নিশ্চিত হয়ে যাবে, এই রাষ্ট্র জাতিসংঘের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রক বিশ্বের শক্তিধর পাঁচ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পরিষদ, আন্তর্জাতিক নিয়ম কানুন এবং বিশ্ব মোড়লদের স্বীকৃত ন্যায়-নীতি ও ইনসাফের মূলনীতি সমষ্টি—যাই বলা হোক না কেন, সেগুলোর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি ঘোষণা করছে আর স্বেচ্ছায় জাহিলিয়াতের বিধি-বিধান কবুল করে নিচ্ছে। [আর বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী আর কে রয়েছে?—আল কোরআন]

২) দ্বিতীয়তঃ জাতিসংঘ কর্তৃক যত সন্ধিচুক্তি হবে বা যত আইন পাস হবে, সবকিছুই 'জাতিসংঘের সনদ' এর অধীনে হবে।

সনদের একশত তিন নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা হয়েছে —

"জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো উপরোক্ত সনদের অধীনে পরস্পরে যত রকমের সন্ধি চুক্তি বা নিয়মকানুন স্থির করবে, সেগুলোর কোনোটা যদি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অন্য কোনো নিয়মের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে সেটাই প্রাধান্য লাভ করবে যা এই এই সনদের অনুকূল হবে।"

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ হাসান নাফেয়া এই অনুচ্ছেদ সম্পর্কে লিখেন—

"আন্তর্জাতিক কোন সংস্থার কার্যবিধি নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করার জন্য যেসকল শপথ ও অঙ্গীকার তৈরি করা হয়, জাতিসংঘের ক্ষেত্রে এই শপথ বা অঙ্গীকার নিছক এমন নয়। জাতিসংঘের এই অঙ্গীকারনামা বরং এর চাইতে অনেক বড় কিছু। এই অঙ্গীকারকে ধরা হয় সমস্ত আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতি ও বিধিমালার সর্বোচ্চ স্তর, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক নীতি।"

ডক্টর সাহেব এরপর অঙ্গীকারনামা থেকে একশত তিন নম্বর অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে তার ব্যাপারে মন্তব্য লিখেন—"এ থেকে বোঝা যায়, 'জাতিসংঘ সনদে' উল্লেখিত কোন মূলনীতি, অনুচ্ছেদ বা বিধির সঙ্গে সাংঘর্ষিক যে কোন প্রকার আন্তর্জাতিক সন্ধি চুক্তি স্থির করা কোন রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত নয়। অন্যভাবে বলা যায়: যে কোন প্রকার রাজনৈতিক আচরণ বা আন্তর্জাতিক কার্যক্রম জাতিসংঘের প্রতিশ্রুতি সমূহের সঙ্গে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক পাওয়া যাবে অথবা পরোক্ষভাবে এসব অঙ্গীকারের কোনটি ব্যাহত করবে, অনিবার্যভাবে তা আন্তর্জাতিক নিয়ম কানুন ও বিধিমালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে বিবেচিত হবে।"

আর এটার ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, যদি কোন রাষ্ট্র জাতিসংঘের এই মৌলিক অঙ্গীকারগুলো মেনে নেয় তবে অন্য যে কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে তার এমন কোন চুক্তি বা সন্ধি করার অধিকার থাকবে না, যে চুক্তি বা সন্ধি জাতিসংঘের শপথে উল্লেখিত বিধিমালা বা মূলনীতি সমষ্টির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়। উদাহরণতঃ যদি যে কোন দুই দেশের সরকার শরিয়া বিধিবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়, অথবা কেবল শিক্ষাব্যবস্থা শরীয়তের অনুকূল করে ঢেলে সাজানোর ব্যাপারে যদি সন্ধিবদ্ধ হয়, তখন এই সন্ধি ও চুক্তি জাতিসংঘ সনদের বিরুদ্ধ হবে। কারণ জাতিসংঘ সনদে সবকিছুই তো ইসলামী শরীয়াহ বিরুদ্ধ। এমতাবস্থায় ঐ দুই সরকারের কর্তব্য হবে এজাতীয় চুক্তি বা দ্বিপাক্ষিক পরিকল্পনা ত্যাগ করা।

এমনিভাবে কোন মুসলিম রাষ্ট্র যদি অপর এমন কোন মুসলিম রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়, যে রাষ্ট্রটি জাতিসংঘের সদস্য কোন কাফের রাষ্ট্রের আগ্রাসন প্রতিহত করে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, যেমনটা ইমারাতে ইসলামিয়া চেচনিয়ায় মুজাহিদিন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তবে সেটা জাতিসংঘ সনদের আলোকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

এমনিভাবে যদি কোন ইসলামী সরকার মুজাহিদদের জাতিসংঘের সদস্য কোন কাফের রাষ্ট্রের আগ্রাসন প্রতিহত করে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সহায়তা প্রদান করে, উদাহরণস্বরূপ যদি ইসরাইলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের মুজাহিদদের সাহায্য করে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে চেচনিয়ার মুজাহিদদের সাহায্য করে, ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে সোমালিয়ার মুসলিমদের সাহায্য করে, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মালির মুসলিমদের সাহায্য

করে অথবা বাশার আল আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে সিরিয়ার মুসলিমদের সাহায্য করে, তবে জাতিসংঘ সনদের আলোকে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

'জাতিসংঘ সনদে' স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের উপর অত্যাবশ্যক হলো - মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে চেপে বসা আগ্রাসী কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে সাহায্য করার যে দায়িত্ব রয়েছে, তা পালন করা থেকে বিরত থাকা।

অর্থাৎ, জাতিসংঘের এই শপথপত্রে যারা স্বাক্ষর করবে, তাদের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে যাবে, স্বাক্ষরিত এই শপথ ও অঙ্গীকারকে সেই ইসলামী শরিয়াহ'র উপর প্রাধান্য দান করা, যে শরিয়াহ মুসলমানদের ভূমি বিজয়ের জন্য জিহাদকে ফরজে আইন বলে সাব্যস্ত করেছে।

সনদে থাকা যে অনুচ্ছেদটি জাতিসংঘের এই শপথের শ্রেষ্ঠত্ব ও একচ্ছত্র কর্তৃত্বকে আরো জোরালো করে, তা হলো, ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র ঊনত্রিশ নং অনুচ্ছেদটি—

"জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোন পন্থায় এসব অধিকারের পক্ষে কিছু করা কখনোই বৈধ নয়।"

কত সুন্দর! স্পষ্টই বলে দেয়া হচ্ছে এই ঘোষণাপত্র মানব শ্রেষ্ঠত্ব, মানুষের স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য রচিত হয়নি; রচিত হয়েছে মানব সভ্যতাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তির ধ্যান-ধারণা ও আদর্শিক ভাবধারার অধীন করার জন্য।

সামনে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ!

***

৩) তৃতীয়তঃ যে কোন রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক নির্দেশিত এসব শপথ মেনে নেয়া শর্ত। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য যে প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যেতে হয়, তার খোলাসা হল, জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করতে ইচ্ছুক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পরিষদের মহাসচিবের কাছে আবেদন পেশ করবে। আর সেই আবেদনের সঙ্গে জাতিসংঘের শপথ ও অঙ্গীকারনামা মেনে নেয়ার ঘোষণা থাকতে হবে।

তাদের এই প্রতিশ্রুতিসমূহ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রয়োজনে জাতিসংঘের সদস্যপদ বাতিল করার বিষয়টিও এর সঙ্গে যুক্ত। কারণ অঙ্গীকার পত্রের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা আছে, সাধারণ পরিষদের অধিকার রয়েছে যেকোনো সদস্যের সদস্য পদ বাতিল করে দেয়ার, যদি সে রাষ্ট্র সনদের মৌলিক নীতির কোনটি পুরোপুরিভাবে ভঙ্গ করে। এমনিভাবে জাতিসংঘের ঐ অঙ্গীকার পত্রে আরো রয়েছে, "আমরা নিশ্চিত করছি যে, এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আমাদের একান্ত প্রচেষ্টা থাকবে"।

আমাদের বিভিন্ন দেশের সরকারেরা জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য সানফ্রান্সিসকো শহরে তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সকল শর্ত পূরণের ব্যাপারে অঙ্গীকার দিয়ে এসেছে। তারা জাতিসংঘের সমস্ত শর্তের প্রতি সম্মতি ব্যক্ত করেছে। আর এ উদ্দেশ্যেই তো জাতিসংঘ নামক আন্তর্জাতিক এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ জাতিসংঘের অঙ্গীকার পত্রের উপর স্বাক্ষর করার দ্বারা বোঝা যাবে, এই রাষ্ট্র কাফেরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করার জন্য এবং শরীয়তের বিধি-বিধানের সাংঘর্ষিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে সম্মত।

এমনিভাবে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এসেছে—

"প্রথম অনুচ্ছেদে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলোর কথা বর্ণিত হয়েছে, সংস্থা ও তার সদস্যরা নিম্নোক্ত মূলনীতিগুলোর আলোকে সেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে:

১- সকল সদস্য রাষ্ট্র (নিজ নিজ অঞ্চলে) নেতৃত্ব ও ক্ষমতা পরিচালনার ব্যাপারে সমান - এই মূলনীতি সামনে রাখা।

২- এই শপথ গ্রহণের দ্বারা সদস্য রাষ্ট্রগুলো যতগুলো বিষয় জরুরি বলে স্থির করেছে, সবকিছু যথাযথভাবে সম্পাদন করা।

অর্থাৎ উদাহরণতঃ অধিকৃত ফিলিস্তিনের উপর ইসরাইলের আগ্রাসন ও ক্ষমতা দখল জাতিসংঘের সদস্য অন্য যে কোন রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক নিজ অঞ্চলে সরকার পরিচালনার মতই। এই যে মূলনীতির কথা বলা হলো তা মেনে নেয়ার ব্যাপারে সকলেই অঙ্গীকারাবদ্ধ!!

এমনিভাবে জাতিসংঘ সনদের পঁচিশতম অনুচ্ছেদে এসেছে: "সদস্য সকল রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত যেকোনো সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ।"

এতসব তথ্য-প্রমাণ থেকে আমাদের সামনে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে - যখনই কোনো রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করতে যাবে, তখনই জাতিসংঘের অঙ্গীকারনামার প্রতি তাদের সম্মতি জানাতে হবে। নির্ধারিত শপথ তাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট নিয়মকানুন এবং সেই অঙ্গীকার পত্রে বর্ণিত সকল শর্ত ও বিধি মেনে নিতে হবে।

***

৪) চতুর্থতঃ জাতিসংঘ সনদের বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে ইসলামী শরীয়াহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ এখানে নারী, পুরুষ এবং মুসলিম ও কাফেরদের মাঝে অধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য রাখা হয়নি।

সনদ পত্রে এসেছে— "আমরা জাতিসংঘের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী! জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে আমরা এ বিষয়গুলো নিজেদের কর্তব্য মনে করি:

— অনাগত প্রজন্মকে আমরা যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করবো।

— আমরা মানুষের মৌলিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য, নারী-পুরুষ সমান অধিকার এবং সকল জাতিগোষ্ঠীর মাঝে সাম্যের নীতি চর্চার ব্যাপারে পুনঃ পুনঃ আমাদের চেতনা ও বিশ্বাসকে জাগিয়ে তুলবো।"

সনদের প্রথম অনুচ্ছেদের তৃতীয় প্যারায় জাতিসংঘের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—"বিশ্বব্যাপী সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যা নিরসনের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ রচনা করা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি, শ্রেণী-জাত-গোত্র, ভাষা ও ধর্ম নির্বিশেষে এবং বিশেষভাবে নারী পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের মৌলিক ও প্রধান স্বাতন্ত্র্যাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি করা।"

এমনিভাবে ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা হয়েছে –

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ আবশ্যকীয় পাঠ্যক্রম চালু করবে এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু নির্দেশনা দেবে। তন্মধ্যে রয়েছে:

"নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষের মৌলিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা"

নিঃসন্দেহে এটা ইসলামী শরীয়তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ অধিকারের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য করে থাকে। ইসলামে উভয় শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক অধিকার রয়েছে।

পুরুষ স্ত্রী পরিজন ও সন্তান-সন্ততির যাবতীয় খরচ বহনের এবং স্ত্রীর মোহরানা আদায়ের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। এমনিভাবে তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তার উপর। ফিতনা-ফাসাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও পাপাচার ইত্যাদি থেকে তাদেরকে রক্ষা করাও পুরুষের দায়িত্ব। অন্যদের শত্রুতার হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করা পুরুষের কর্তব্য। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه فهو شهيد

"যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হবে সে শহীদ। যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হবে, নিজ প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হবে, নিজের দ্বীনদারী ও ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হবে, সে ব্যক্তি শহীদ।"

আর নারী নিজের স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারে আদিষ্ট। এমনিভাবে স্বামীর অর্থ-সম্পদ, বিষয়াদি ও সন্তান-সন্ততিকে তদারকি করা স্ত্রীর দায়িত্ব। সাধারণ নেতৃত্ব, বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রম ও সেনাবাহিনী পরিচালনা, পুরুষের জামাতে সালাতের ইমামতি এমনকি ফরজে কিফায়া পর্যায়ের জিহাদের দায়িত্ব কোনটাই নারীর জন্য নয়।

এমনিভাবে আবশ্যকীয় সতর বা লজ্জাস্থানের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রেও শরীয়তে নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী আইন শাস্ত্রে সাক্ষ্য প্রদান,

মিরাছ প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধানের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তে নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু জাতিসংঘে এসবের কোন বালাই নেই।

আমাদের পবিত্র ইসলামী শরীয়ত বিভিন্ন বিষয়ে মুসলমানের সঙ্গে কাফেরের পার্থক্য নির্দেশ করেছে। এ কারণেই সাধারণ নেতৃত্ব বা বিচারক পদে কাফেরকে নিয়োগ দেওয়ার বৈধতা নেই। কাফেরের জন্য যাকাত আবশ্যক নয়। শুধু তাই নয় বরং শরীয়ত কাফেরদের মাঝেও বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ নির্দেশ করেছে। একশ্রেণীর কাফেরকে বলা হয় আহলুজ জিম্মা। এমনিভাবে মুস্তামিন, মুআহিদ তথা শর্ত ও নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ কাফের এবং হারবি বা যুদ্ধরত কাফের সহ আরো বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে, যা নিয়ে ইসলামী শরীয়তে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

কিন্তু এ বিষয়ে জাতিসংঘ সনদে যে বিশ্বাস ও মূলনীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা ইসলামী শরীয়তের সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ তাদের নোংরা চেতনাই গোটা মানব সভ্যতার উপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি জাতিসংঘ নামক আন্তর্জাতিক এই সংস্থা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ রচনার জন্য প্রতিষ্ঠিত কোনো সংস্থা নয়। বরং এটি এমন একটি সংগঠন, যেখানে বিশ্বের অপরাধী চক্রের প্রধানেরা সমস্ত মানুষের আকীদা-বিশ্বাস নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করার জন্য এবং বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার জন্য তৈরি করেছে।

***

৫) পঞ্চমতঃ এই অঙ্গীকার পত্র ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিকতার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য - নারী-পুরুষ সকলের অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। পঞ্চান্নতম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

“জাতিসংঘের একটি কাজ হবে, ... মানবাধিকার। সকল মানুষের জন্য অবাধ স্বাধীনতার প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাবোধকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া। আর এই ক্ষেত্রে বর্ণ, ভাষা ও ধর্মের ক্ষেত্রে থাকবে না কোনো বিভেদ এবং নারী-পুরুষে থাকবে না কোনো প্রভেদ।”

'জাতিসংঘ সনদ' মানুষের যে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার কথা বলছে তা কেবল এই ক্ষেত্রে নয় যে, মানুষ বেশ ভালোভাবে জাগতিক জীবন যাপন করবে। বরং এর চেয়ে জঘন্যতম স্তরের স্বাধীনতার কথাও বোঝানো হয়েছে এই সনদে। আর তা হল - যিনা-ব্যভিচার, পুরুষে পুরুষে অথবা নারীতে-নারীতে সমকামিতা, ধর্ম ত্যাগ ও মুরতাদ হওয়া—এমন ব্যাপারগুলোতে লিপ্ত হবার অবাধ স্বাধীনতা। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং জাতিসংঘের সম্মেলনগুলোতেও এ ব্যাপারে খুবই জোর দেয়া হয়েছে। সামনের আলোচনায় আমরা তা দেখতে পাব ইনশাআল্লাহ!

***

৬) ষষ্ঠতঃ জাতিসংঘ সনদে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ভূমি ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং এসব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্য কারো সশস্ত্র শক্তি ব্যবহারের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কাজ করবে। অর্থাৎ জাতিসংঘের এই সনদে যারাই স্বীকৃতির স্বাক্ষর করবে, তাদের জন্য মুসলমানদের ভূমিগুলো অবৈধভাবে অধিকৃতদের পক্ষে অবস্থান নেয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে।

জাতিসংঘের সেই সনদপত্রে এসেছে— "সুনির্ধারিত মূলনীতি সমষ্টি স্বীকার করে নেয়া এবং এসব মূলনীতি পালনের জন্য আবশ্যকীয় ব্যাপারগুলোতে অঙ্গীকার স্বাক্ষরিত করার মধ্য দিয়ে আমরা এ কথা মেনে নিচ্ছি যে, সম্মিলিত স্বার্থের বাইরে কখনো কোন প্রকার সশস্ত্র শক্তি ব্যবহার করা হবে না।"

অর্থাৎ তাদের কথার খোলাসা হল, জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সম্মিলিত স্বার্থ ছাড়া কখনোই কিতাল জায়েজ হবে না। তাই যদি মুসলমানরা ইজরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গিয়ে ফিলিস্তিন স্বাধীন করার চেষ্টা করে, অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানরা যদি তাদেরকে এক্ষেত্রে সহায়তা করে, তবে জাতিসংঘের সনদের ভিত্তিতে তা হারাম ও অবৈধ বলে গণ্য হবে। কারণ ইজরাইল জাতিসংঘের অন্যতম শক্তিশালী একটি সদস্য রাষ্ট্র। আর তার বিরুদ্ধে মুজাহিদদের সহায়তা করা কখনোই তার স্বার্থের অনুকূল কোনো বিষয় নয়।

এভাবে আমরা আরও মিলিয়ে নিতে পারি রাশিয়ার বিষয়কে। এই রাশিয়া চেচনিয়া, মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন মুসলিম ভূখণ্ড এবং ককেশাসে অবৈধ দখল বসিয়ে রেখেছে। এমনিভাবে আমরা মিলাতে পারি ভারতের অবস্থাকে। তারা কাশ্মীর দখল করে

রেখেছে। স্পেন দখল করে রেখেছে সেউটা এবং মেলিলা, চীন দখল করেছে পূর্ব তুর্কিস্তান, ইথিওপিয়া অধিকারে নিয়েছে জেইলা এবং হারা, টাঙ্গানিকা জাঞ্জিবার দখল করেছে, কেনিয়া সোমালিয়ার কিছু অংশ দখল করেছে, ফ্রান্স মালি দখল করেছে ইত্যাদি।

শরীয়ত যেখানে অধিকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার এবং কাফেরদের কর্তৃত্ব থেকে দখল করা অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে মুক্ত করার জন্য কিতাল করাকে ফরজে আইন সাব্যস্ত করেছে, সেখানে জাতিসংঘের নির্দেশনা আমরা দেখতেই পেলাম।

'মুলতাকাল আবহুর' গ্রন্থের শরাহ মাজমাউল আনহুর-এ আছে—

"যখন ব্যাপকভাবে বের হবার ডাক আসবে, তখন জিহাদের জন্য বের হওয়া প্রথমত ফরজে আইন হবে এমন শ্রেণীর উপর যারা শত্রুর অধিক নিকটবর্তী এবং জিহাদ করতে সক্ষম। পরবর্তী স্তরে ফরজে আইন হবে ঐ সকল শ্রেণীর উপর যারা তাদের পরে রয়েছে এবং শত্রু পক্ষ থেকে কিছুটা দূরে তাদের অবস্থান। এ অবস্থায় যারা শত্রুর অধিক নিকটবর্তী তারা যদি শত্রুর মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে যায় কিংবা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অবহেলা ও উদাসীনতা বশতঃ জিহাদ না করে, তবে তাদের পরবর্তী শ্রেণীর উপর ফরজ হয়ে যায়। অতঃপর তৎপরবর্তী শ্রেণীর উপর। এভাবেই চক্রবৃদ্ধি হারে পূর্ব-পশ্চিম তথা গোটা বিশ্বের মুসলমানদের উপর ফরজ হয়ে যায়।"

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ তায়ালা বলেন:

"এ কারণেই জিহাদ গোটা মুসলিম উম্মাহর উপর ফরজে আইন হয়ে আছে। আর তা কেবল এখন থেকে নয় বরং যেদিন ইসলামী আন্দালুস তথা স্পেনের পতন ঘটেছে, সেই ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ তথা আজ থেকে ৫ শতাব্দী ধরে ফরজে আইন হয়ে আছে। আর গোটা এই পাঁচশত বছর যাবত মুসলিম উম্মাহ সামগ্রিকভাবে গুনাহগার হয়ে আছে কারণ আন্দালুস এখনো পুনরুদ্ধার হয়নি।

আজ যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে আছে তখন তা কেবল আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিন স্বাধীন হবার মাধ্যমেই আমাদেরকে দায়িত্বমুক্ত করবে না। বরং ফরজ দায়িত্ব তখনই পুরোপুরি পালিত হবে যখন এমন প্রতিটি ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার হয়ে যাবে, একদিনের জন্য হলেও যেখানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পতাকা উচ্চকিত ছিল।

অতএব আপনার উপর জিহাদ ফরজ থাকবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, যেমনিভাবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষ নামাজের ফরজ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না। অতএব মৃত্যু অবধি সকল মানুষের উপর জিহাদ ফরজে আইন। অতএব আপনি আপনার তরবারি হাতে নিন এবং জমিনের বুকে বিচরণ করতে থাকুন। আল্লাহর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটবার আগ পর্যন্ত এই ফরজে আইন দায়িত্ব শেষ হবে না।

আর যেমনিভাবে কারো জন্য এ কথা বলা জায়েজ নেই যে, আমি গত বছরের সিয়াম পালন করেছি তাই এবছর আমি বিশ্রাম নিতে চাই অথবা আমি গত সপ্তাহের জুমার সালাত আদায় করেছি অতএব এই সপ্তাহে আমি বিশ্রাম নিতে চাই। একইভাবে এ কথা বলাও জায়েজ হবে না যে, আমি গত বছর জিহাদ করেছি তাই এ বৎসর আমি বিশ্রাম নিতে চাই"।

সনদপত্রের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের চতুর্থ দফায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

"সংস্থার সকল সদস্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষায় হুমকিমূলক যেকোনো পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে। যেমন জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিরোধী পন্থায় সংস্থার সদস্য যে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আচরণ অথবা শান্তি বিরোধী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।"

এমনিভাবে দশম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—

"প্রতিটি রাষ্ট্র রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য এবং আঞ্চলিক নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পোষণে অঙ্গীকারবদ্ধ"

একথার দাবী হল: সনদপত্রে যারাই স্বাক্ষর করবে তাদের জন্য জরুরি হলো, জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও অভ্যন্তরীণ শান্তি নিরাপত্তা রক্ষায় সচেষ্ট থাকা। আর ইসরাইল, ভারত, রাশিয়া, চীন, স্পেন, ইথিওপিয়া ও কেনিয়া সহ আরও যত রাষ্ট্র মুসলমানদের ভূমি অধিকার করে রেখেছে, তাদের এসব আগ্রাসনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা! এগুলোর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করা এবং এগুলোর বৈধতার স্বীকৃতি দেয়া - সনদপত্রে স্বাক্ষরকারী প্রতিটি সদস্যের কর্তব্য।

এ কারণে আমি বারবার বলি, যারাই জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করবে, তাদের স্বাক্ষর একথার স্বীকৃতি বলেই বিবেচিত হবে যে, মুসলিম যে ভূখণ্ডগুলো স্বাধীন

করার প্রচেষ্টা শরীয়ত আমাদের উপর ওয়াজিব করেছে, সেসব ভূখণ্ডে কাফের রাষ্ট্রগুলোর আগ্রাসন বৈধ।

আমার মুসলিম, মুজাহিদ ও সত্যনিষ্ঠ আলেম ভাইদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আমি তাদের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাই যে, জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্ত মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি দেশ জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছে। কারণ জাতিসংঘের সনদপত্রে ইসরাইল সহ সদস্য প্রতিটি রাষ্ট্রের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতি রক্ষার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

এমনিভাবে সনদে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে মুসলিম দেশগুলো শরীয়তের দ্বারা বিচার ফায়সালা বর্জন করেছে, নিরাপত্তা পরিষদের ও সাধারণ পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মতি দিয়েছে। আর যেহেতু ১৯৪৭-এর ফিলিস্তিন ভাগ, রেজুলেশন ২৪২ সহ অন্যান্য পরাজয়ের ধারা পরিষদের সিদ্ধান্তেরই অংশবিশেষ, তাই এসব পরাজয় মেনে নেয়াও মুসলিম দেশগুলোর কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আস-সাহাব মিডিয়াঃ

'রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য' এবং 'আঞ্চলিক পরাশক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ' এর নাম ব্যবহার করে জাতিসংঘ যা করে থাকে সে সম্পর্কে শহীদ (আল্লাহর কাছে তাঁর ব্যাপারে আমরা তেমনটাই আশা রাখি) রাষ্ট্রপতি জেলিম খান ইয়ান্দারবি (Zaylim Khan Yandarbi) 'রাজনীতি ও বাস্তবতার মাঝে দাঁড়িয়ে চেচনিয়ার অবস্থা মূল্যায়ন' (Chechnya, between politics and reality) নামক স্বীয় মূল্যবান গ্রন্থে লিখেছেন—

"খ্রিস্টান বিশ্ব এবং খ্রিস্টান জাতিগোষ্ঠীর অবস্থা দেখে সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, জাতিসংঘ তার কার্যক্রম পরিচালনা করে - উপনিবেশ ও বিজাতীয় আগ্রাসন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য। কিন্তু অন্যান্য ধর্মমতাবলম্বী জাতিগোষ্ঠীর অবস্থা দেখলে মনে হয়, বিশেষত মুসলিম জাতির সঙ্গে তাদের আচার-আচরণ দেখে বোঝাই যায়, এ জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছে নতুন আঙ্গিকের ঔপনিবেশিক শাসনের বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার উপযোগী শর্তাবলী সারাবিশ্বে চাপিয়ে দেয়ার জন্য।

আমরা সহজে এভাবে বলতে পারি: এই জাতিসংঘ গঠনের মাধ্যমে অ-খ্রিষ্টান জনগণের প্রতি বৈষম্য আর সর্ব উপায়ে তাদের অধিকার খর্ব করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিজেদের তৈরি নিয়মকানুন দ্বারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিকার খর্ব করার জন্য যে পন্থাগুলো সবচেয়ে বেশি তারা ব্যবহার করে থাকে তন্মধ্যে রয়েছে - তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে ব্যক্তি স্বাধীনতা, দেশের শান্তি-স্থিতি ও অবিভাজ্যতা রক্ষা মূলক 'মূলনীতি'র মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়া। এর দ্বারা তারা ক্রমাগত এসকল দেশকে চাপের মধ্যে রাখে।

দেশের শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং রাষ্ট্রের বিভাজন রোধের মূলনীতি আন্তর্জাতিক আইনে সংযুক্ত হয়েছে প্রায় ত্রিশ বছর হলো। সুনির্দিষ্টভাবে বললে এই মূলনীতি সংযুক্তির পিছনে মূল কারণ হলো, ঔপনিবেশিকতা থেকে যেসব রাষ্ট্রের মুক্তি পশ্চিমা বিশ্বের স্বার্থের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে, তৃতীয় বিশ্বের এমন দেশগুলো নিয়ন্ত্রণ করা ও তাবেদার সরকারগুলোর প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখা। আর সেই তখন থেকে, বরং আরো আগে থেকেই এই মূলনীতিকে মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ মুসলিম বিশ্ব বরাবরই ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভের জন্য সংগ্রাম করে এসেছে।"

***

৭) সপ্তমতঃ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্বাতন্ত্র্য বিনাশ। সংস্থার প্রধান নিয়ন্ত্রক অপরাধী চক্রের হোতা বিশ্বের পাঁচ দেশের স্বার্থের লড়াইয়ে সদস্য দেশগুলোকে দাসের মত ব্যবহার-

জাতিসংঘের সনদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পঞ্চম দফায় বলা হয়েছে:

"সংস্থার প্রতিটি সদস্য এই সনদের আলোকে যেকোনো কার্যক্রমে জাতিসংঘকে সহায়তা দেবার জন্য নিজেদের সাধ্যের সবটুকু ব্যয় করবে। এমনিভাবে সংস্থা যে সমস্ত কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ বা বিলোপযোগ্য বলে মনে করবে, তেমন কার্যক্রমের উদ্যোক্তা যে কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা থেকে বিরত থাকবে।"

শুধু তাই নয় বরং ৪৩ তম অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে —

"জাতিসংঘের সকল সদস্য এ বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবে যে - বৈশ্বিক শান্তি, স্থিতি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষায় নিরাপত্তা পরিষদের কার্যক্রমের অধীনে

সশস্ত্র বাহিনী, লজিস্টিক সাপোর্ট ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা সহ যত কিছু আন্তর্জাতিক শান্তি নিরাপত্তা ও স্থিতি রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয়—নিজ ভূমি অতিক্রমের অনুমোদনও যার অন্তর্ভুক্ত—এমন সব ধরনের সহায়তা দেবার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে।"

এমনিভাবে জাতিসংঘের সনদের ৪৫ তম অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা হয়েছে—সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে নিরাপত্তা পরিষদের আহ্বানে যৌথ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে জাতীয় বিমান বাহিনীকে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখতে বাধ্য থাকবে। নিরাপত্তা পরিষদ ঐ ইউনিটগুলির শক্তি, প্রস্তুতি ও যৌথ কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ করবে এবং নিজেদের অধীনে তাদেরকে পরিচালনা করবে।"

অর্থাৎ জাতিসংঘের সদস্য হলে, মুসলমানদের জন্য জরুরি হবে - আপন মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে জাতিসংঘকে সাহায্য করা। জাতিসংঘ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে আপন ভাইদের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের পাশে থাকতে হবে। আর জাতিসংঘ যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে, তেমন কোনো মুসলিম গোষ্ঠীকে সাহায্য করার অধিকার কোন মুসলমানের নেই। যেমন ফিলিস্তিনের মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে, চেচনিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে, ইরাক, আফগানিস্তান, বসনিয়া অথবা সোমালিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাই এসব মুসলিম গোষ্ঠীর কাউকে সাহায্য করার অধিকার কোন মুসলিম জাতি গোষ্ঠীর নেই।

অর্থাৎ মুসলমানরা এমনভাবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অপরাধীদের দাসে পরিণত হয়ে যাবে যে, তাদের অধীনে মুসলমানরা নিজেদের যুদ্ধ পরিচালনা করবে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য জীবন বিলিয়ে দেবে।

আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা ইরশাদ করেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

"অর্থঃ হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে

তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না”। (সূরা মায়েদা ৫:৫১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا

“অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের ওপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে?” (সূরা আন নিসা ৪:১৪৪)

***

১৯৪৮ সালে প্রকাশিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন

জাতিসংঘের সনদের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনের পর এখন আমি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত ‘মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র’ সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরবো।

***

‘ফুরসান তাহতা রাইয়াতিন নাবিয়্যি’ (‘নববী পতাকাতলে কতক অশ্বারোহী’) গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে আমি এই ঘোষণাপত্রের সাধুতা ও বৈধতার স্বরূপ নির্মাণের জন্য কিরূপ প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়েছে সেটা উল্লেখ করেছিলাম। বিশ্বের অপরাধী চক্রের প্রধানরা চেয়েছে বিশ্বের ওপর তারা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা চাপিয়ে দিবে। মুসলিম জাতিকে তাদের হারানো গৌরব, ভূমি ও নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার করতে বাধা দিয়ে, পৃথিবীর বুকে নিজেদের এজেন্ডা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করবে।

কিন্তু এখানে আমি অল্প এমন কিছু উদাহরণ পেশ করেই ক্ষান্ত দেব, যেগুলো ইসলামী শরীয়তের মৌলিক বিষয়াবলীর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক।

সেসব উদাহরণ উপস্থাপন করার আগে আমি গুরুত্বপূর্ণ দুটো পয়েন্ট এখানে উল্লেখ করতে চাই।

প্রথমটি হলো: জাতিসংঘ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তির আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি রূপে গঠিত হয়েছে। এ কারণেই 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র'- জাতিসংঘ যেটি প্রকাশ করেছে, সেখানে বিশ্বের পরাশক্তি রাষ্ট্রগুলোর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। শুধু তাই নয়; বরং গোটা মানব জাতি এবং বিশেষত মুসলমানদের ওপর ধর্মহীন চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা চাপিয়ে দেবার ব্যাপারে পশ্চিমাদের যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, সেটা বাস্তবায়নের বিষয়টাও গুরুত্ব পেয়েছে।

দ্বিতীয় পয়েন্ট হল: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলগুলোর অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ হলো - ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যারা বিজয়ী হয়েছে, তারাই ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠালগ্নে তাদেরকে সমর্থন দিয়েছে। ১৯৪৮ সালের মে মাসের ১৪ তারিখে তারাই ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তারিখ মেলালে দেখা যায়, স্বীকৃতি প্রদানের এই ঘটনা ছিল মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র প্রকাশের সাত মাস আগের। শুধু তাই নয়; বরং তারা ইসরাইল রাষ্ট্রের বৈধতার স্বীকৃতি ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত দেশবিভাগের সিদ্ধান্তেরই ভিত্তিতে দিয়েছে। অতএব ইসরাইলকে স্বীকৃতি বাস্তবিকপক্ষে দেশবিভাগের পূর্ব সিদ্ধান্তের বাস্তব প্রতিফলন মাত্র।

আমাদের আলোচ্য ঘোষণাটি জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশন কর্তৃক জারি করা হয়েছিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি এলিয়ানর রুজভেল্ট (Eleanor Roosevelt), যিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের বিধবা স্ত্রী। এই ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট হলেন সেই ব্যক্তি, যে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সমর্থনদান এবং ইহুদি সম্প্রদায়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য বেশ পরিচিত।

পূর্ব ইউরোপের কিছু অঞ্চল সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণ-বলয়ে ছেড়ে দেবার বিনিময়ে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জাতীয় আবাসনের ব্যবস্থা এবং ইহুদি অভিবাসনের সমস্ত বাধা অবিলম্বে অপসারণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তিনিই স্টালিন ও চার্চিল উভয়ের সঙ্গে ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'ইয়াল্টা সম্মেলনে' (Yalta Conference) একমত হন। ঘোষণাপত্রটির প্রধান লেখক রেনে ক্যাসিন ছিলেন একজন ফরাসি রাজনীতিবিদ। যখন ঘোষণাটি জারি করা হয়েছিল তখন জাতিসংঘে তিনি ছিলেন ফ্রান্সের প্রতিনিধি। অর্থাৎ যখন আলজেরিয়ায় আগ্রাসন

চালানো হচ্ছিল, সেখানকার আরব ও মুসলিম জনগণের ওপর লৌহ, অগ্নি, হত্যা ও জেল-জুলুমের মাধ্যমে ফরাসী ভাষা ও জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছিল, যা ছিল জায়নবাদী ইহুদি এজেন্ডা, তখন এই জাতিসংঘে ফ্রান্সের প্রতিনিধি ছিলেন এই রেনে ক্যাসিন। তিনি ইহুদিদের অধিকার আদায়ের দাবির পক্ষে শক্তিশালী ভূমিকা পালনকারী ছিল। আর উত্তর আফ্রিকায় ফরাসি উপনিবেশবাদের অন্যতম সহায়ক ব্যবস্থা তথা ফরাসি-ইসরাইলি জোটের প্রধান সে-ই ছিল।

১৯৪৭ সালে ইহুদিদের ব্যাপকহারে দেশত্যাগ এবং ফিলিস্তিনে ইহুদি অভিবাসনের সুযোগ তৈরি ও বৃদ্ধির অনুমতি দেয়ার জন্য ফিলিস্তিন সংক্রান্ত জাতিসংঘের কমিটি আহ্বান করেছিল এই রেনে ক্যাসিন। তার নেতৃত্বে ফরাসি-ইসরাইলি জোট জায়নবাদী আন্দোলনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অনেক কাজ করতে পেরেছে। জায়নবাদী সে সব পদক্ষেপ ও পরিকল্পনার মধ্যে ছিল - ফিলিস্তিনে ব্যাপকহারে ভূমি ক্রয়, আরব বিশ্বের কয়েকটি ক্ষুদ্র অঞ্চলকে বহু ভাগে বিভক্তিকরণ, পূর্ব ইউরোপ থেকে ইহুদি অভিবাসীদের কৃষি উপনিবেশ-ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্থানান্তর ইত্যাদি।

এই ছিল আমাদের আলোচ্য ঘোষণাপত্রের রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমির সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন। এখন যদি আমরা সে ঘোষণাপত্রের দিকে দায়সারাভাবে নজর দিই, তবুও নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আমাদের সামনে ভেসে ওঠে।

***

এই ঘোষণাপত্রের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—

“এ ঘোষণায় উল্লেখিত স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহে গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্যবিধ মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, জন্ম, সম্পত্তি বা অন্য কোন মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকবে।

কোন দেশ বা ভূখণ্ডের রাজনৈতিক, সীমানাগত বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে তার কোন অধিবাসীর প্রতি কোনরূপ বৈষম্য করা হবেনা; সে দেশ বা ভূখণ্ড স্বাধীনই হোক, হোক অছিভূক্ত, অস্বায়ত্বশাসিত কিংবা সার্বভৌমত্বের অন্য কোন সীমাবদ্ধতায় বিরাজমান।”

একটু আগে আমরা উল্লেখ করেছি যে, এ বিষয়টি পুরোপুরি শরীয়ত বিরোধী। কারণ মুসলমানরা কখনোই কাফেরদের বরাবর হতে পারে না।

কিন্তু এখানে যে বিষয়টি আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তা হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ যারা ছিল তারা হল ধর্মহীনতায় লিপ্ত, নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত, মুক্ত বল্গাহীন এক জাতি। তারা নিজেদের এই ধ্যান-ধারণা সকল মানুষের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়।

আর স্বভাবতই তাদের ধ্যান-ধারণা মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস বিরোধী। কারণ মুসলমানরা আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলার এই বাণীর প্রতি ঈমান রাখে—

إيّاك نعبد وإيّاك نستعين

"অর্থঃ আমরা কেবল আপনার ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি"। (সূরা ফাতিহা ১:৪)

মুসলমানরা এমন জাতি, নিজেদের সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতনের সময়ও তাওহীদ, শরীয়তের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং মদ, জুয়া, যিনা-ব্যভিচার ও সর্বপ্রকার অশ্লীলতা নিষিদ্ধ হবার জ্ঞান লালনের কারণে যারা অনন্য। তাইতো ধর্মহীন শত্রুপক্ষ বুঝে গিয়েছিল, মুসলমানদের শক্তির রহস্য তাদের আকিদা, বিশ্বাস ও শরীয়তের মাঝে। মুসলমানদেরকে এই আকিদা ও শরীয়ত থেকে বিচ্যুত করার জন্য গর্হিত কর্মকাণ্ড, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার ওপর তারা স্বাধীনতা ও মানব ধর্মের খোলস চড়িয়ে দেয়।

এরপর তারা ধীরে ধীরে মুসলমানদেরকে বোঝাতে থাকে, যদি তোমরা বিশ্বসভায় অন্যদের মিত্রতা পেতে চাও, যদি তোমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বের স্বীকৃতি পেতে চাও, অন্যদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যদি তোমরা এগিয়ে যেতে চাও, তবে অবশ্যই তোমাদেরকে জাতিসংঘের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। আর জাতিসংঘের সদস্য হবার জন্য তোমাদেরকে জাতিসংঘের সনদ ও সিদ্ধান্তসমূহের ওপর স্বাক্ষর করতে হবে। তারা এটাই বুঝাতে চাচ্ছে যে, যত রকম কুফরি ও ধর্মহীনতা জাতিসংঘের মাঝে রয়েছে, সব কিছুর ব্যাপারে তোমাদের সম্মত হতে হবে এবং সেগুলোকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এভাবেই মুসলমানদের ওপর জাতিসংঘের নির্দেশনা পালন করার জন্য

এবং কুফরি এই সংস্থার অকল্যাণকর পরিকল্পনামাফিক কাজ করার জন্য চাপ সৃষ্টির পথ তৈরি হয়ে যাবে।

আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা সত্যই বলেছেন—

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

"অর্থঃ তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না"। (সূরা নিসা ৪:৮৯)

***

ঘোষণাপত্রের তৃতীয় ধারায় এসেছে—

"জীবন, স্বাধীনতা এবং দৈহিক নিরাপত্তায় প্রত্যেকের অধিকার আছে।"

এখানে অশ্লীলতা, বেহায়াপনায় লিপ্ত হওয়া এবং ধর্মহীন মুরতাদ হবার স্বাধীনতাও অন্তর্ভুক্ত।

***

ঘোষণাপত্রের ষষ্ঠদশ অনুচ্ছেদে এসেছে—

"ধর্ম, গোত্র ও জাতি নির্বিশেষে সকল পূর্ণ বয়স্ক নর-নারীর বিয়ে করা এবং পরিবার প্রতিষ্ঠার অধিকার রয়েছে। বিয়ে, দাম্পত্যজীবন এবং বিবাহবিচ্ছেদে তাঁদের সমান অধিকার থাকবে।"

নিঃসন্দেহে ইসলামী শরীয়ত এমন ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে। কারণ এই ঘোষণাপত্রে অমুসলিম পুরুষের জন্য কোন মুসলিম নারীকে বিবাহ করার অনুমতি

ও বৈধতা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন অধিকারের প্রশ্নে এই ঘোষণাপত্রে নারী-পুরুষে কোন পার্থক্য রাখা হয়নি যেমনটা পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

***

পঞ্চম অনুচ্ছেদে এসেছে—

"কোন মানুষকে এমন কোন শাস্তি দেয়া যাবে না, শাস্তিমূলক এমন কোনো কঠোর আচরণ করা যাবে না এবং পাশবিক আচরণ করা যাবে না, যা মানব সম্মানের ধারণাকে ব্যাহত করে।"

শাস্তিমূলক কঠোর ব্যবস্থা যেমন শরিয়া হদ সমূহ: কিসাস বা মৃত্যুদণ্ড, চোরের হাত কাটা, বেত্রাঘাত ও রজম বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড।

***

মানবাধিকারের সার্বজনীন এই ঘোষণাপত্রের অষ্টাদশ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা হয়েছে—"প্রত্যেকেরই ধর্ম, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। এ অধিকারের সঙ্গে ধর্ম বা বিশ্বাস পরিবর্তনের অধিকার এবং এই সঙ্গে, প্রকাশ্যে বা একান্তে, একা বা অন্যের সঙ্গে মিলিতভাবে, শিক্ষাদান, অনুশীলন, উপাসনা বা আচারব্রত পালনের মাধ্যমে ধর্ম বা বিশ্বাস ব্যক্ত করার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।"

***

এ ঘোষণাপত্রের উনবিংশ অনুচ্ছেদে এসেছে—"মুক্ত চিন্তা ও বাক স্বাধীনতা প্রতিটি ব্যক্তির অধিকারভুক্ত হবে। এই অধিকারের মাঝে যে সমস্ত বিষয় শামিল সেগুলো হলো, যে কোনো রকমের নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ হতে মুক্ত থেকে ব্যক্তি যে কোন প্রকার চিন্তা গ্রহণ করতে পারবে। সেসব চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা যে কোন পন্থায় গ্রহণ করা যাবে আবার প্রচার করা যাবে। এক্ষেত্রে ভৌগোলিক সীমারেখার কোন বালাই থাকবে না।"

অর্থাৎ এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হলো ধর্ম ত্যাগ ও মুরতাদ হবার স্বাধীনতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার প্রচার-প্রসার, প্রকাশ্যে শরীয়ত প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি।

***

একবিংশ অনুচ্ছেদে এসেছে—

“জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারের শাসন ক্ষমতার ভিত্তি; এই ইচ্ছা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্ত হবে; গোপন ব্যালট কিংবা সমপর্যায়ের কোন অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।”

অর্থাৎ ক্ষমতা ও আইন প্রণয়নের উৎস হলো জনগণের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা। এই উৎসের ওপর শরিয়া বিধি-বিধান কোন প্রকার হস্তক্ষেপ চালাতে পারবে না। জনগণ যদি শরীয়তের দ্বারা বিচার ফয়সালা করতে চায় তাহলে ক্ষমতাসীনদের দায়িত্ব হবে তাদের এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করা। আর যদি জনগণ চায় শরিয়া বিরোধী আইন দ্বারা বিচার ফায়সালা করাবে, তাহলে ক্ষমতাসীনদের কাজ হবে সেগুলো দিয়েই বিচার-ফয়সালা করা।

***

ইউনেস্কোর কার্যক্রম

ইউনেস্কো - জাতিসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক পরিষদের একটি সংক্ষিপ্ত নাম। জাতিসংঘের অধীন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ পরিষদ ও কর্তৃপক্ষের একটি হলো এই ইউনেস্কো। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে এই পরিষদকে জাতিসংঘে অঙ্গীভূত করা হয়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পরিষদের অনেক ভূমিকা রয়েছে। তাদের অনেক প্রকাশনাও রয়েছে। উল্লেখযোগ্য একটি প্রকাশনা হল - ‘মানবজাতির ইতিহাস এবং এর সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির এনসাইক্লোপিডিয়া’। এর তৃতীয় খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদ ‘ইসলাম’ শব্দের ব্যাখ্যায় এসেছে —

১) ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম এবং আরব্য পৌত্তলিকতার সুবিন্যস্ত মিশ্রণ হলো ইসলাম।

২) কোরআন এমন একটি গ্রন্থ যাতে কোনো বালাগাত (ভাষা অলংকার) নেই।

৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ের দীর্ঘকাল পর কিছু মানুষের স্বরচিত বক্তব্য-সমাহার হলো হাদীসে নববী। সেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্বন্ধিত করা হয়।

৪) মুসলিম ফুক্বাহা (আইন শাস্ত্রবিদ) পারসিক ও রোমক আইনশাস্ত্র এবং তাওরাত ও গির্জার আইন কানুনের ভিত্তিতে ইসলামী ফিকহ রচনা করে।

৫) ইসলামী সমাজে নারীর কোন মূল্য নেই।

৬) ইসলাম জিম্মিদের ওপর জোরপূর্বক জিজিয়া ও খারাজ চাপিয়ে দেয়।

সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সরবরাহকৃত অর্থের মাধ্যমে জাতিসংঘের অর্থায়নে পরিচালিত হয় এই ইউনেস্কো। অর্থাৎ যদি কোন মুসলিম রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে, তবে সে রাষ্ট্রকে মুসলমানদের অর্থ-সম্পদের একাংশ ব্যয় করতে হবে ইউনেস্কোর জন্য। আর জাতিসংঘ সে অর্থ ব্যয় করবে মুলহিদ ও ইসলামের শত্রুদের পেছনে।

আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মোহাম্মদ উমর রহিমাহুল্লাহ তা'আলা-র আমলে ইমারাতে ইসলামিয়া যখন বৌদ্ধমূর্তি ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন ইউনেস্কো ইসলামী ইমারতের ওপর অপবাদ আরোপের জন্য নিন্দনীয় প্রচারণা শুরু করে।

তখন ইউনেস্কোর মহাপরিচালক শিরো মিতুরা - যে একজন জাপানিজ বৌদ্ধ - বিভিন্ন দেশকে রাজনৈতিক মধ্যস্থতার অনুরোধ জানায়। তার প্রতিনিধি দশ দিনের বেশি সময় অবস্থান করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ দু'টো বৌদ্ধমূর্তি ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত থেকে তালেবানকে ফেরাতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। ইউনেস্কো পঁয়তাল্লিশ জন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীকে এই দুটি মূর্তি সম্পর্কে কথা বলা, এগুলো রক্ষার দাবি জানানো এবং এতদুদ্দেশ্যে চাপ সৃষ্টি করার জন্য একত্রিত করে।

***

জাতিসংঘ এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের কার্যত শত্রুতাঃ

ধর্মীয় অনুশাসন ও নীতি নৈতিকতার ব্যাপারে জাতিসংঘের নেতিবাচক মনোভাবের কিছু বহিঃপ্রকাশঃ

• নারী ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্মেলন:

জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা শীর্ষক কায়রো সম্মেলন। ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত নারী শীর্ষক বেইজিং সম্মেলন। এরপর ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত নারী বিষয়ক নিউইয়র্ক সম্মেলন। এমনই বিভিন্ন সম্মেলন জাতিসংঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

এই সকল সম্মেলনে খোলাখুলিভাবেই জাতিসংঘ যিনা-ব্যভিচার, নারী ও পুরুষের সমকামিতা, বিবাহ বিলম্বিত করা, পতিতাবৃত্তিকে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন, যুবকদেরকে বিবাহের আগে অশ্লীলতায় লিপ্ত হবার প্রতি উৎসাহদান এবং নারী-পুরুষের পূর্ণ সমান অধিকার ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানায়।

***

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত নেয়ার মাধ্যমে ফিলিস্তিন ইস্যুতে জাতিসংঘ মুসলিম উম্মাহর ওপর আঘাত করে। অতঃপর ১৯৬৭ সালে ২৪২ রেজুলেশনে ইসরাইলকে বৃহত্তর অংশ প্রদান করে।

আর বসনিয়ায় জাতিসংঘের ভূমিকা এমন - মুসলমানদের কাছে অস্ত্র রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, সার্বদেরকে মুসলিম হত্যার জন্য ছেড়ে দেয়া এবং নিজেরা নীরবে এই হত্যাকাণ্ড দেখতে থাকা। স্রেবেনিকা গণহত্যায় এক হত্যাযজ্ঞে ৭০০০ মুসলমান নিহত হয়।

চেচনিয়ার ব্যাপারে জাতিসংঘের ভূমিকা হল, এই দেশটিকে জাতিসংঘ খ্রিস্টান রাশিয়ার অংশ বলে ঘোষণা করে দেয়। এই জাতিসংঘ ইরাকের ওপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। সেগুলোর কারণে অর্ধ মিলিয়ন ইরাকি শিশু নিহত হয়। প্রায় ষাট বছর আগে উত্থাপিত কাশ্মীরিদের স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে অস্বীকৃতি জানায় এই জাতিসংঘই।

আর আফগানিস্তানের ব্যাপারে জাতিসংঘের ভূমিকা হল, 'বন সম্মেলনে' জাতিসংঘ মার্কিন এজেন্টদেরকে একত্রিত করে। অতঃপর একটি নির্বাচনী প্রহসনের ব্যবস্থা করে জাতিসংঘ যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধ চলাকালে আফগানিস্তানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত জারি করে। আফগানিস্তানে সংঘটিত গণহত্যার ব্যাপারে জাতিসংঘ বরাবরই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে আসছে। কিল্লা-ই-জঙ্গীর ঘটনা, শিবারগান কারাগারে বন্দীদেরকে স্থানান্তরিত

করার সময় তৃষ্ণা ও শ্বাসরোধে হত্যা, বাগরাম, কান্দাহার, শিবারগান ও গুয়ান্তানামো বে কারাগারে হাজার হাজার বন্দীদের ওপর অমানবিক নির্যাতনের ঘটনা থেকেই সেই বাস্তব প্রমাণ আমরা পেয়ে যাই।

সোমালিয়াতেও জাতিসংঘের পতাকায় আমরা যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে দেখি। জাতিসংঘের অন্তর্গত ইথিওপীয়, বুরুন্ডিয়ান, উগান্ডান ও কেনিয়ান বাহিনী সোমালিয়ায় আগ্রাসনে অংশগ্রহণ করে। দক্ষিণ সুদানকে বিভক্ত করার ক্ষেত্রেও প্রধান ভূমিকা জাতিসংঘের। তারাই এই দেশভাগকে স্বাগত জানিয়েছিল।

আর বর্তমানে জাতিসংঘ বাহিনী ফিলিস্তিনের বাইরের মুজাহিদিন কর্তৃক ভেতরের ভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সাহায্য সরবরাহের পথ বন্ধ করে অভ্যন্তরীণ মুজাহিদিনের ওপর সর্বাত্মক অবরোধ আরোপের উদ্দেশ্যে লেবাননের সীমান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া থেকে পূর্ব তিমুর পৃথক হবার পর এই জাতিসংঘ-ই স্বীকৃতি প্রদান করে। অথচ একই ধরনের স্বীকৃতি তারা চেচনিয়া, মুসলিম ককেশাস, কাশ্মীর, মেলিলা সেউটা, বসনিয়া— কোন মুসলিম অঞ্চলকেই দিতে রাজি নয়।

***

পরিশিষ্ট

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, জাতিসংঘ এমন কোনো সংস্থা নয় যা আন্তর্জাতিকভাবে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার পথ তৈরি করতে গঠিত হয়েছে। এটি এমন একটি সংস্থা যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী পক্ষ ধর্মহীনতার ভিত্তিতে গঠন করেছে। সারাবিশ্বে নিজেদের চিন্তা-ধারা, ধ্যান-ধারণা ও প্রভাববলয় বিস্তৃত করার জন্যই এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা। সংক্ষেপে বললে, এটা এমন এক সংস্থা যা আল্লাহর শরীয়তের প্রতি দায়বদ্ধ নয়। ধর্মহীনতা ও মুরতাদ হবার আহ্বান জানায় এই সংস্থা। ইসলাম ও মুসলমানদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালাগাল করা এবং মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা এই সংস্থার চরিত্র।

ইসলামী শরীয়তের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী, রিদ্দা ও ধর্মহীনতায় নাখোশ, এসবে বারণকারী, আল্লাহর দ্বীন ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং মুসলিম ভাইদেরকে সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা লালনকারী কোনো মুসলমানের পক্ষে কেমন করে জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার বিষয়টা মেনে নেয়া সম্ভব?

স্মরণ করছি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্বের সেই বাণী—

"সকলেই বলো, আমি কি পৌঁছে দিতে পেরেছি? হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো!"

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

****